আদিবাসীদের অস্তিত্বের টানাপড়েন

বোর্নিওর জঙ্গলের যাযাবর জাতি পেনান, কেনিয়ার মরুভূমি অঞ্চলের পশুপালক এরিয়লি, বলিভিয়ার রুক্ষ্মভূমির চিপায়া কৃষক আমাদের জানায় যে, অন্য ধরনের জীবনযাত্রা ও ধ্যানধারণা এ পৃথিবীতে রয়েছে। সারাবিশ্বে প্রায় তিনশ' মিলিয়ন মানুষ অর্থাৎ পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় শতকরা পাঁচভাগ লোকের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে যা তারা বহুবছর ধরে টিকিয়ে রেখেছে, অন্য সংস্কৃতির সাথে মিশ্রণ ঘটেনি এবং এই সংস্কৃতিতে তারা অটল... লিখেছেন **সোনিয়া ইয়াসমিন**

উত্তর কলম্বিয়ার কোজি ইন্ডিয়ানদের মধ্যে একটি প্রথা বিদ্যমান, একটি চার বছর বয়সী শিশুকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুরোহিততন্ত্রে দিক্ষিত করার জন্য সিয়েরা নেভাদার উঁচু অঞ্চলে নিয়ে রাখা হয়। এর পরের আঠারো বছর সূর্যালোকের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে রাখা হয় তাকে। এভাবে সমাজ থেকে সরিয়ে পাথরের কুঁড়েতে নয় নয় (অর্থাৎ আঠারো বছর) রাখা হয় যাতে সে মাতৃগর্ভের নয় মাসকে বুঝতে পারে। আর এই স্বর্গীয় মাতার গর্ভে থাকাকালীন সময়ে সে শুধু অন্ধকার ও ছায়ার সাথে পরিচিত হবে, তাই তার অন্তর্দৃষ্টি বিকশিত হবে, সে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলতে পারবে বিশ্বের বস্তুগত মায়ার ভেতর থেকেও। অবশেষে বহুবছরের অধ্যয়ন ও কঠোর অনুশীলনের পর বহির্জগতে উন্মোচনের সময় হয়। এক রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে, সূর্য যখন পাহাড়ে উঁকি দিচ্ছে তখনই সে বাইরের আলোর সাথে পরিচিত হলো। এর আগ পর্যন্ত জগতের অস্তিত্ব শুধু তার চিন্তায় ছিলো। এখন এই প্রথমবারের মতো সে প্রকৃত জগতকে দেখলো। সে যা শিখেছিলো তা মিলে যাচ্ছে। তার পাশে দাঁড়ানো তার শিক্ষক দিগন্তের দিকে তাকিয়ে যেন বলতে চাইছে 'দেখছো তো, যা বলেছিলাম জগতটা সে রকমই।'

এই রীতি মাত্র একটি উদাহরণ যাতে বোঝা যায় যে সংস্কৃতি মানুষের কল্পনাকে কতো অসীম করে। হাইতিতে ভুড়ু ধর্মযাজিকারা বাদ্যের তালে সাড়া দেয় হাতে জ্বলন্ত কয়লার টুকরো নিয়ে। আমাজানের নিম্নভূমিতে ওয়াওরানি শিকারীরা পশুদের মূত্র শনাক্ত করে এবং সেই সাথে তা কোন পশুর তাও নির্ধারণ করতে পারে। মেক্সিসোর মাজাটেক কৃষক তাদের কথার টান অনুকরণ করে শিসের মাধ্যমে প্রশস্ত উপত্যকার অন্য প্রান্তের মাজাটেক অধিবাসীদের জটিল সংবাদ পাঠায়। এর শব্দসম্ভার শিসের ওপর ভিত্তি করে গঠিত।

এখনও বিশ্বে এমন এলাকা আছে যেখানকার মানুষ বিশ্বাস করে যে জাগুয়ার শামন ছায়াপথ ছাড়িয়েও অনেক দূরে এখন ভ্রমণ করছে, কিংবা পূর্বপুরুষদের উপকথা (যেমন আথাপাসকানদের) এখনও অর্থপূর্ণ

আরিয়াল গোত্রের জোসেফ লিকুটন আমেরিকায় পড়াশোনা করেছেন। গরুর পালে হামলাকারীদের ঠেকাতে তাদের জন্যে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

(বাঁয়ে) চিপায়া উপজাতির এই তিনজন কঙ্কালের খুলি নিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের কৃতিত্ব উদযাপন করছে

তাদের কাছে। তারা হয়তো আমাদের থেকে আলাদা কিন্তু সেটাও এক ধরনের বাস্তবতা। বোর্নিওর জঙ্গলের যাযাবর জাতি পেনান, কেনিয়ার মরুভূমি অঞ্চলের পশুপালক এরিয়লি, বলিভিয়ার রুক্ষভূমির চিপায়া কৃষক আমাদের জানায় যে, অন্য ধরনের জীবনযাত্রা ও ধ্যানধারণা এ পৃথিবীতে রয়েছে। সারাবিশ্বে প্রায় তিনশ’ মিলিয়ন মানুষ অর্থাৎ পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় শতকরা পাঁচভাগ লোকের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে যা তারা বহুবছর ধরে টিকিয়ে রেখেছে, অন্য সংস্কৃতির সাথে মিশ্রণ ঘটেনি এবং এই সংস্কৃতিতে তারা অটল। কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের সাথে তারা উপকথা ও স্মৃতি দ্বারা আক্রান্ত এবং নিজস্ব ইতিহাস ও ভাষায় তাদের শিকড় গ্রোথিত। তা সত্ত্বেও বর্তমানে জীবন সম্পর্কে তাদের ধ্যানধরণা বদলে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে।

ব্রাজিলে স্বর্ণ অধিকার প্রচেষ্টা ইয়ানোমামিদের রোগাক্রান্ত করেছে। এক দশকেই একচতুর্থাংশ অধিবাসী মৃত্যুর মুখে পড়ে আর বাকি ৮৫০০ জীবিতদের ভেতর অনেকেই অনাহারে কাটায় ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। নাইজেরিয়ায় তেল কোম্পানির পরিত্যক্ত বর্জ্য নাইজার নদী তীরবর্তী এক-সময়ের উর্বর ভূমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট করে দিয়েছে আর এ অঞ্চল ছিলো ওগনিদের বাসভূমি। তিব্বতে মঠে ও বিহারে জ্ঞানচর্চা করা হয় কিন্তু চীনাদের কারণে তাও কমে যাচ্ছে। আর কঙ্গোর বনে বাইরে থেকে আসা যৌনরোগ ও অন্যান্য রোগে পিগমিরা ধ্বংসের সম্মুখীন।

এগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সারাবিশ্বেও তা ঘটছে। আর এটা বিংশ শতকের একটি বৈশিষ্ট্য যা এ শতকেও প্রযোজ্য। এই সংকট নির্ধারণের জন্য সবচেয়ে ভালো পরিমাপক হচ্ছে— ভাষার বিলুপ্তি। ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, প্রায় দশ হাজারের মতো কথ্য ভাষার অস্তিত্ব ছিলো অথচ বর্তমানে মাত্র ছয় হাজার ভাষায় কথা বলা হয় আর এর অনেকগুলোই বাচ্চাদের শেখানো হয় না। তাই কার্যত এগুলো ইতিমধ্যেই মৃত, মাত্র তিনশ’টি ভাষায় প্রায় এক লক্ষাধিক লোক কথা বলে। হয়তো আগামী শতকে বর্তমানের কথ্যভাষার অর্ধেকই হারিয়ে যাবে। ভাষা শুধু একগুচ্ছ শব্দ বা ব্যাকরণের নিয়ম নয়, এটা মানুষের আত্মশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এর সাহায্যেই সংস্কৃতির সারাংশ বস্তুজগতে আত্মপ্রকাশ ঘটায়। এটা সজীব কোনো কিছুর মতোই স্বর্গীয় ও রহস্যময়। তাই কোনো জাতির মৃত্যুতে আমরা যতোটা শোক প্রকাশ করি, ভাষার বিলুপ্তিতেও কি তা করা উচিত নয়! জীববিদ্যা সংক্রান্ত উপমা এখানে প্রাসঙ্গিক। নতুন কোনো প্রজাতির জন্মের দ্বারা ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে বিলোপসাধন স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু বর্তমানে মানুষের সংঘটিত কার্যক্রমের দ্বারা যে হারে বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তি হচ্ছে তার কোনো নজির নেই। একইভাবে ভাষা, সংস্কৃতি, প্রজাতি সবসময়ই বিকশিত হয়, পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। কিন্তু বর্তমানে ভাষা আশংকাজনক হারে হারিয়ে যাচ্ছে— এক বা দুই প্রজন্মের মধ্যে। এমআইটির জনৈক অধ্যাপক শোকগ্রস্ত হয়ে বলেচেন যে কোনো ভাষা হারিয়ে ফেলা আর লুভ যাদুঘরে বোমা মারা একই কথা। ভাষা হারিয়ে গেলে সংস্কৃতিরও মৃত্যু ঘটে। পৃথিবী অনেক কম কৌতুহলোদ্দীপক জায়গা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা অনেক জ্ঞান পরিত্যাগ করছি— যা হাজার হাজার বছরের অর্জন। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে এই যে, এই প্রাচীন সংস্কৃতিসমূহ নিজস্ব পথে পরিবর্তিত হবার মতো মুক্ত থাকবে কিনা অর্থাৎ আধুনিক বিশ্বের উপযোগী দিকগুলো গ্রহণ ও তাদের রীতিনীতি ও মূল বিষয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন দিক বাদ দিতে তারা সক্ষম হবে কি না। এর উত্তরের জন্য বোর্নিওর রেইন ফরেস্ট, পূর্ব আফ্রিকার মরুভূমিতেও যেখানে প্রাচীন যাযাবর জাতি বা উপজাতির বাস।

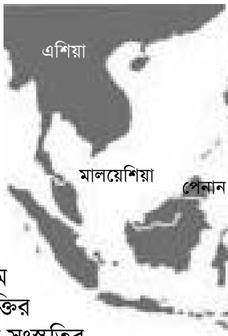

পেনান

পেনানরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক প্রাচীনকাল থেকে বাস করছে। তারা জঙ্গলে থেকে শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। কিন্তু বর্তমানে সাত হাজার পেনানের ভেতর মাত্র তিনশ’ পেনানই যাযাবর জীবন যাপন করছে। অন্যরা সরকারের ব্যবস্থায় লং ইমানে বাস করছে। যেহেতু বিশ্বের তেত্রিশ শতাংশ কাঠ মালয়েশিয়া থেকে রপ্তানি হয়, তাই ব্যাপকহারে এ জঙ্গল থেকেও কাঠ কাটা হচ্ছে। ফলে পেনানরা পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছে। লঙ ইমানে নতুন বাসস্থানে তাদের বদ্ধ জীবন,

চিপায়া নারী তার ছাগল পালের পেছন চলছে

মুক্ত বাতাস নেই। সন্ধ্যে হলে শিশুরা টেলিভিশন সেটের সামনে জড় হয়, টেলিভিশনে মালয়েশিয়ার সাংবাদিকের খবর পাঠ বা এ ভাষার অনুষ্ঠান বাচ্চাদের ভেতর কয়েকজন বুঝতে পারে। এখানকার বাড়িগুলো সুনির্মিত, কিন্তু বনের মতো খাদ্যের প্রাচুর্য এখানে নেই। ত্রিশ বছর আগে এখানে বসতি গড়ে ওঠে, সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো বিদ্যালয় বা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার, কিন্তু এখনও তা হয়নি। কর্মসংস্থানের সুযোগও অপ্রতুল, কাঠের গুদামে শারীরিক কাজই বেশি, আর অভিজ্ঞতা না থাকায় কৃষিকাজে পেনানরা খুব একটা দক্ষ নয়। এ কারণেই অতীতের সমৃদ্ধ দিনগুলোর কথা তাদের বার বার মনে পড়ে। বনে তাদের দিন বেশ কাটছিলো, এখনও যেসব পেনান বনে বাস করে তারা গহীন অরণ্যে থাকে। কানাডার এক ভাষাবিদ পেনান ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়নে আগ্রহী। এতে অনেক সময় দিতে হচ্ছে। পেনানরা সরকারের প্রতি বেশ ক্ষুব্ধ। কারণ বন উজার হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের আবাসভূমি সংকুচিত হচ্ছে। যাযাবর পেনান আমসহ অন্যান্য ফল খেয়ে জীবন ধারণ করে। সেই সাথে পশুও শিকার করে। সারাদিন এসব কাজেই তারা ব্যাপৃত থাকে। তারা কাঠ সংগ্রহে বাঁধা দিয়েছিলো। ফলে এদের নেতাকে জেলে যেতে হয়। সে সময় এ নিয়ে বেশ সাড়া পড়ে যায়। তাদের এ যুদ্ধ ছিলো পৃথিবীকে বাঁচানোর সংগ্রাম। আদিকাল থেকে বনের গাছপালা, পশুপাখি প্রতিটি জিনিসের প্রতি যত্নবান তারা। এটাই তাদের পরিচিত জগৎ। তাদের উপকথা, ঐতিহ্যে বন বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। তারা যখন বর্তমান অবস্থার কথা মনে করে তাদের কান্না পায়। এতে শুধু তাদের জীবিকার উপায় নষ্ট হবে না, সেই সাথে তাদের জাতিসত্তারও যেন মৃত্যু ঘটবে। তাদের এই আবাসস্থল শুধু তাদের বাসভূমিই নয়, তাদের ইতিহাস এই প্রাকৃতিক ভূমিতেই চিত্রিত। এক ঝর্ণারই কতো অসংখ্য বিচিত্র নাম, আর প্রতিটি নামের সাথেই জড়িয়ে আছে ইতিহাসের বিশিষ্ট কোনো ঘটনা বা ব্যক্তির স্মৃতি। বুলডোজার আর রাস্তা তৈরির ফলে অনেক কিছুই মুছে গেছে।

পেনান জাতির লোকেরা শিকার করলেও তারা ভাবতেই পারে না ঘরে কোনো পশু পালন করে তা বধ করার কথা। ভেষজ বিদ্যায় তারা বেশ পারদর্শী। আশপাশের গাছপালার পাতা তারা ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে। কিছু পাতা রোগ সারায়, কোনো কোনো পাতা আবার মৃত্যু ঘটাতে পারে। আবার শিকারি কুকুরের শক্তি বাড়ায়— এক ধরনের পাতা কিংবা অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা বিশেষ প্রকারের পাতার রয়েছে বলে পেনানরা বিশ্বাস করে। আবার গাছ থেকে নিঃসৃত রজন, আঠা ব্যবসায়ীদের কাজে লাগে, ঝুড়ি বানানোর কাঁচামালও পাওয়া যায়। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ গাছটি হচ্ছে সাগু, পাম গাছ একে জীবনের বৃক্ষ বলা হয়। এর একটা অংশ চিড়ে দিলে এর থেকে মজ্জা বের হয়। এরপর পানির সাহায্যে এ থেকে লেই বের করা হয়, যা শুকালে পরে সাগু ময়দায় পরিণত হয়। আর এটাই যাযাবরদের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

প্রকৃতির বিভিন্ন শব্দকে বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ বলে তারা মনে করে। জঙ্গলের শক্তিশালী যাদু হিসেবে বিদ্যুৎ চমককে বিবেচনা করা হয়, ময়ূরের গানে গাছে ফুল ফোটে, কচি পাতা জন্মায়, কোনো এক নির্দিষ্ট দিক থেকে পাখির ডাক শোনা গেলে সুসংবাদ পাওয়া যায়, আবার এই ডাক অন্য দিক থেকে এলে তা দুঃসংবাদের বাহক হয়। মাছরাঙ্গার ডাক শিকারিদের শিকারে যেতে যেন নিরুৎসাহী করে।

পেনানরা অন্যদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এদের লেখার চল নেই। ভাষা মৌখিক। তাই যিনি গল্প বলায় দক্ষ তার জ্ঞান সেই ভাষার শব্দ সম্ভারকে নির্দেশ করে। সে ‘এর’ জন্য একটি শব্দ কিন্তু ‘আমরা’র জন্য ছয়টি শব্দ ব্যবহৃত হয়। সাগুর সমার্থক আটটি শব্দ, কারণ এটা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্ভিদ। কোনো কিছু ভাগ করে নেয়াটা বাধ্যতামূলক, তাই ধন্যবাদসূচক কোনো শব্দ নেই। শত শত গাছের আলাদা নাম রয়েছে কিন্তু ‘বন’-এর জন্য কোনো শব্দ তাদের ভাষায় নেই। তাদের বিশ্ব বিভক্ত ‘টানা লিহেপ’ (ছায়াময় ভূমি), ‘টানা লালুন’ (প্রাচুর্যময় স্থান) এবং ‘টানা টাসা’ (যে ভূমিকে ধ্বংস করা হয়েছে)।

সরকার চাচ্ছে পেনানরা লং ইমানের মতো কোনো স্থানে বসতি গড়ে তুলুক। কিন্তু বনের পেনানদের অভিমত সেখানে সাগু নেই, গাছপালা উজাড় করা হয়েছে আর ভূমিকে ধ্বংস করা হয়েছে, পশুরাও চলে গেছে, নদীগুলো কর্দমাক্ত। বনে শক্ত কাঠের ওপর ঘুমালেও পেট ভরে খাওয়া যায়। ১৯৯৩ সালে ইউরোপীয় ও এশীয় নেতাদের প্রতি এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ মন্তব্য করেছিলেন, ‘আমাদের নীতি হচ্ছে পর্যায়ক্রমে জঙ্গলবাসীদের মূলস্রোতে নিয়ে আসা... এই অসহায়, অর্ধভুক্ত এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে রোমাঞ্চকর কিছু নেই।’ সারাওয়াকের গৃহায়ণ ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক মন্ত্রী জেইমস অং বলেন, ‘আমরা চাই না তারা প্রাণীদের মতো ঘুরে বেড়াক। কারও নৈতিক অধিকার নেই মালয়েশিয়ার সমাজের সাথে পেনানদের মিশে যাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার। যদিও পুনর্বাসনের ফলে গুটিকয় পেনান লাভবান হয়েছে কিন্তু বেশির ভাগ পেনানের কোনো লাভ হয়নি।

মালয়েশিয়ার এই নীতিসমূহের নিন্দা জানিয়েছেন বিশ্বের কিছু নৃতাত্ত্বিক ও মানবাধিকার কর্মী। জনৈক নৃতাত্ত্বিকের মতে— গণহত্যায় যেখানে মানুষের শারীরিক মৃত্যু ঘটে তা বিশ্বব্যাপী ঘৃণিত অথচ কোনো জাতি, তার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা হলে সেখানে মানুষের জীবন যাত্রার বিলোপ সাধন ঘটে তা ঘৃণিত হচ্ছে না বরং তার সপক্ষে যুক্তি দেখানো হচ্ছে।

মালয়েশীয়রা পেনানদের পশ্চাদমুখিতা থেকে মুক্ত করতে চাইছে, যার অর্থ তাদের প্রকৃত সত্তা থেকে তাদের মুক্ত করা। বলা হচ্ছে, পেনানদের উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে আদিবাসীরা টিকতে পারবে না। ধারণা করা হয় যে, আদিবাসীরা পরিবর্তিত হতে অক্ষম এবং তারা হারিয়ে যাবে। কিন্তু নৃতাত্ত্বিকের মতে, বাইরের শক্তির আধিপত্য যখন বেশি হয় কিংবা খুব বেশি প্রতিকূল অবস্থা যখন চাপিয়ে দেয়া হয় তখনই তারা নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না। কারণ তারা তা বুঝতে পারে না।

চিপায়া উপজাতির নারীরা চুলে বেনি করছেন। এতে প্রয়োজন সূক্ষ্ম নিপুণতার। বহু প্রজন্মের ঐতিহ্য ধরে রাখে এসব ছোট ছোট রেওয়াজ

এরিয়াল ও রেনডাইল

উত্তর কেনিয়ার মারসাবিট পাহাড়ি অঞ্চল হ্রদে পরিপূর্ণ। বনভূমি ও তৃণভূমির প্রাচুর্যও বিদ্যমান। হাজার হাজার বছর ধরে পশুপালক যাযাবর জাতি এখানে বাস করছে। তবে তাদের একস্থান থেকে অন্যত্র ঘুরে ঘুরে পশু চরাতে হয়। তাই গতিশীলতা তাদের জীবন যাপনের মূল দিক। প্রকৃতির বিরূপ আচরণে খরার সৃষ্টি হয়। খরা তাদের জীবনের অংশ। এদেরকে খরা ও অনাবৃষ্টি মোকাবেলা করেই বাঁচতে হয়।

১৯৭০ ও '৮০-এর দশকের ভয়াবহ খরাসমূহে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইথোপিয়ার ও সোমালিয়ার দুর্ভিক্ষের প্রভাব পড়ায় সেসময় আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ত্রাণ বিতরণে এখানে এসে পৌঁছায়। মিশন স্থাপিত হয়, সেই সাথে হাসপাতাল, গির্জা ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাদের বিনামূল্যে বিতরণকৃত খাদ্য শুষ্ক অঞ্চল থেকে আদিবাসীদের টেনে আনতো। এ সময় পশ্চিমা উন্নয়নকারী সংস্থাসমূহ যাযাবরদের দোষী সাব্যস্ত করলো অতিরিক্ত পশুচারণের মাধ্যমে তাদের পরিবেশের বিপর্যয় ঘটানোর জন্য। অথচ বাস্তব অবস্থা ভিন্ন ছিলো। ১৯৭৬ সালে জাতিসংঘ বহু মিলিয়ন ডলার খরচ করলো মারসাবিট জেলার উপজাতি বিশেষ করে এরিয়াল ও রেনডাইলদের পুনর্বাসনের জন্য, উদ্দেশ্য ছিলো নগদ অর্থনীতিতে তাদের প্রবেশ করানো। কনের মা পুরুষ অতিথিদের পা দুধ দিয়ে ধুয়ে দেন। ষাঁড় জবাই করা হয়। অতিথিরা তা ঝলসে খান। মহিলারা কনের কাছে বসে গান গেয়ে ওঠেন 'বিধাতা অনেক বিশাল যেন পর্বতমালার মতো; আর বধূটি সুন্দরী, সুগন্ধীর মতো মিষ্টি।' এরপর পড়ন্ত বিকেলে যোদ্ধাদের নাচ শুরু হয় যা কিছু লোককে মত্ত করে তোলে। এ বসতির থেকে বেশ অনেকটা দূরে যোদ্ধা ও বেশ কিছু তরুণ পশুর পাল দেখাশোনা করে। রাতে খোলা আকাশের নিচে, পাথরের মতো শক্ত মাটিতে শুয়ে থাকে। বুনো লতাপাতার স্যুপ, টাটকা দুধ এবং বকনা বাছুরের গলার রক্ত খায়। তাদের জীবনে পশুদের গুরুত্ব অপরিসীম। যদি গরুগুলো হারিয়ে যায়, তবে জীবনের প্রতি বিশ্বাসই যেন হারিয়ে যায়, রীতিনীতি অনুষ্ঠানসমূহ অর্থহীন হয়ে পড়বে। এ সংস্কৃতিতে সবকিছু এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যাতে ঝুঁকির সাথে মোকাবেলা করা যায়। পশুর পাল অনেক বড় রাখা হয় যাতে অত্যন্ত কিছু প্রাণী বেঁচে থাকে। পশুর পাল বজায় রাখা অত্যাবশ্যক। অনেক পশুর মালিক একাধিক স্ত্রী ও সন্তান লাভে উৎসাহী হয়। দেখা যায়, বৃদ্ধদের তিন-চারটি স্ত্রী রয়েছে, ফলে যুবকদের পাত্রী সংকট দেখা দেয়। তাই অনেক যুবককে দূরের পশুচারণ ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়া হয় যেখানে তারা যোদ্ধা হিসেবে নিজেদের সম্পদ রক্ষা করার জন্য অন্য জাতির সাথে লড়াই করবে। আর যোদ্ধাদের সে জীবনে উৎসাহী জরার জন্য এ পেশাকে নানাভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। এক অনুষ্ঠানে তরুণদের সাহসের পরীক্ষা নেয়া হয়। লিঙ্গাগ্রের ত্বকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঁচড় দেয়া হয়। দুধে তাদের গোসল করানো হয়। উপহার হিসেবে তারা পশুর পাল পায়। এ সময় কেনিয়ার একটা শ্রেণীর মানুষ মনে করে যে আদিবাসীরা পশ্চাৎমুখী, শিক্ষা ও আধুনিকায়নই দেশের ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। তাই তারা জাতিসংঘের এ কার্যক্রমকে স্বাগত জানায়। দশ হাজার এরিয়াল পশুপালকের জন্য পরিস্থিতি বেশির ভাগ অঞ্চলে এতোটা ভয়াবহ ছিলো না যে তারা পুনর্বাসন ক্যাম্পে যেতে বাধ্য হবে। মারসাবিটের পশ্চিম পাশে এবং নডতোর পাদদেশে পানি প্রায় সবসময়ই পাওয়া যেতো, তারা এসব স্থানে পশুর পাল রাখতো। আর নিচের সমতলে উট খাদ্য খুঁজে নিতো। কিন্তু অন্যদিকে প্রায় ত্রিশ হাজার রেনডাইল যারা কাইসুট মরুভূমিতে উট চরাতো তারা ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হয়। অনেক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে রিলিফ ক্যাম্পে হাজারে হাজারে রেনডাইল উপস্থিত হয়। ১৯৮৫ সাল নাগাদ অর্ধেকেরও বেশি রেনডাইল অভাবগ্রস্ত হয়ে কোর ও কারগির নিম্নাঞ্চলের শহরের আশপাশে থাকতো। তাদের অবস্থা মিশনের দানের ওপর নির্ভরশীল ছিলো।

এরিয়ালদের বাড়ি গাছের শাখা ও মাটি দিয়ে তৈরি অনেকটা গম্বুজ আকৃতির। এরিয়াল যোদ্ধারা লম্বা আকৃতির হয়, চুল বেশ দীর্ঘ এবং তা আঁটসাঁট করে বিনুনিতে বাঁধা, চুল রং করা, সমস্ত শরীর বিভিন্ন ধরনের অলংকারে সজ্জিত। প্রত্যেকেই অস্ত্র বহন করে চামড়ার খাপে আটকানো তলোয়ার, লোহার বর্শা, কাঠের লাঠি, রাইফেল। নাচগানের সময় যোদ্ধারা মেয়েদের তাদের চুলের সাহায্যে ঝেড়ে দেয়, বাতাসে লাফ দেয়, সেসময় চাঁদের আলোয় বর্শাগুলো ঝকমক করে ওঠে। নাচগান সারা রাতভর চলে। বৃষ্টি পরিমাণ মতো হওয়ায় ঘাস ও দুধের প্রাচুর্য দেখা যায়। অত্যন্ত আনন্দের সময় তা উদ্‌যাপনের ব্যবস্থাও নেয়া হয় এবং প্রায় প্রতিদিনই এখন বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে। উপহার সামগ্রীর ওপর নজর রাখা হয়। সংস্থার নাম সম্বলিত টিন, কার্ডবোর্ড, পাট ও ছনের তৈরি মোটা কাপড় দিয়ে তাদের ছাদ

আচ্ছাদিত। শহরে এক চক্কর ঘুরলেই বোঝা যায় যে পশ্চিমা বিশ্বের প্রতিটি দেশই এই মরুদ্যানের নির্ভরশীলতা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

অনেক রেনডাইলের কোরে আসার পেছনে শুধুমাত্র খাদ্য নয় শিশুদের শিক্ষার সুযোগও অন্যতম কারণ। অন্তত একটি শিশুকে দুর্ভিক্ষের সময় স্কুলে ভর্তি করালে নগদ অর্থনীতিতে প্রবেশ সহজ হবে। এখন অনেকেই পশু বিক্রি করে, ধারদেনা করে চেষ্টা করছেন মারসাবিটের বাইরে বড় শহরের আরো ভালো কোনো স্কুলে পড়াতে। পাস করে সেসব সন্তানরা চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষকতা, ট্যুর গাইডিংসহ যে কোনো কিছুতে উচ্চশিক্ষা নিতে আগ্রহী। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া সহজ নয়। আর কেনিয়ার শহরগুলোতে বেকারত্বের হার শতকরা পঁচিশ ভাগ।

তাই শিক্ষাও অনেক সময় তাদের কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়ে যায় না। বরং তারা সংস্কৃতির অনেক কিছুই ভুলে যায়। পাশ্চাত্যের ধর্মীয় শিক্ষা কিংবা পাশ্চাত্যের ধ্যানধারণা তারা লাভ করে। খুব অল্প সংখ্যক উপজাতি শিক্ষিত তরুণ ভালো কোনো পেশায় জড়িত হতে পারে। বেশির ভাগই সেরকম, এসময় সাহসের সাথে তার মোকাবেলা করতে হয়, না হলে সে তার গোষ্ঠীকে অপমানিত করলো, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন মারও খেতে হতে পারে যার ফলে তার মৃত্যু ঘটবে।

পাহাড় থেকে দশ-বারো দিনের যাত্রার পর লিওগোসো ও লোসিডানের নিম্নাঞ্চল, এরিয়াল যাযাবররা নডোতো পাহাড়ের ধারেও বাস করে। আর এরপরই কোর শহর যেখানে রেনডালদের পুনর্বাসন হয়েছে। লিওগোসো ও লোসিডানে মহিলা ও শিশুরা পশু চরায়।

ভাগ করার রীতি অনুযায়ী তানান তরুণীটি লাংঘট ফল বিলাচ্ছে

মরুভূমিতে চিকিৎসক ও ভবিষ্যৎ বক্তার দেখাও মিলবে যিনি লতাপাতা ও তুকতাক মন্ত্রের সাহায্যে চিকিৎসা করেন ও ভবিষ্যৎ বলেন।

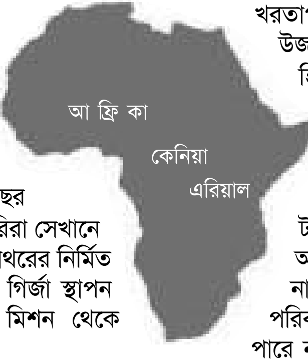

কিছুদিন আগেও, এমনকি ১৯৭৫ সালেও কোর ছিলো মৌসুমকালীন পানির ভান্ডার যেখানে রেনডাইল উট পালকরা ছোট ছোট দলে আসতো। সে বছর ইটালির ধর্মপ্রচারক বা মিশনারিরা সেখানে দোকানপাট, বিদ্যালয় এবং পাথরের নির্মিত একটি বড় রোমান ক্যাথলিক গির্জা স্থাপন করে। আর এখন সেখানে মিশন থেকে হাঁটার দূরত্বে প্রায় পঁচিশ হাজার ঘরবাড়ি, ষোলো হাজার স্থানীয় অধিবাসী এবং ১৭০টি হস্তনির্মিত কুয়া রয়েছে। মরুভূমিতে বালুঝড় ও খরতাপ থেকে যে বৃক্ষ আশ্রয় দিত তা উজাড় হয়েছে। অধিকাংশই জ্বালানি হিসেবে কয়লায় পরিণত করা হয়েছে। যেসব রেনডাইলের এখনও উট বা ছাগল রয়েছে তারা শহর থেকে অনেক দূরে এগুলো চরাতে নিয়ে যায়। টাটকা দুধ দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে, অনেক শিশুর কপালেই তা জোটে না। গাছ থেকে প্রাপ্ত বিশেষ আঁশের পরিবর্তে এখন রিলিফ সুবিধা করতে পারে না। তবু নিজস্ব অঞ্চলে অন্যদের সহযোগিতা পাওয়া যায় কিন্তু শহরে কেউ ফিরেও তাকায় না।

এরিয়ালদের অনেকেই পাশ্চাত্য ঘেঁষা শিক্ষার কুফল বুঝতে পারছে। তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের শক্তি ও বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে হলে নতুন ধরনের শিক্ষা হয়তো দরকার যেখানে পাঠ্যসূচি তাদের পেশা পরিবেশ উপযোগী হবে। যাযাবর ছাত্রদের দূরের বোর্ডিং-এ না পাঠিয়ে, তাদের কেরানি হবার শিক্ষায় শিক্ষিত না করে, শিক্ষকদের যাযাবরদের আবাসস্থলে পাঠানো যেতে পারে। যেখানে তারা পশু চিকিৎসা, চারণভূমির যত্ন এবং শুষ্ক ভূমির পরিবেশ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারবে।

শেষ পর্যন্ত সেসব সংস্কৃতিই বেঁচে থাকবে যার সাথে সংশ্লিষ্ট জাতি তা রক্ষা করতে ইচ্ছুক ও সক্ষম হবে, যারা নতুন অবস্থাকে তাদের নিজেদের সুবিধামত গ্রহণ করতে পারবে। পেনানরা আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। অথচ খরা ও দুর্ভিক্ষের মাঝেও কেনিয়ার এরিয়ালরা বেঁচে থাকার একটা পথ খুঁজে বের করেছে, অন্তত এখনকার মতো।

মাটি খুঁড়ে কিনোয়া পণ্য রোপণ করছে চিপায়ারা